Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 January 2009 02:34 -

সম্প্রতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশে। বিজয়ী হলো তারাই যারা ১৯৭০ এ নির্বাচিত হওয়ার পর বাংলাদেশে ইসলামের নামে রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিল। নিষিদ্ধ করেছিল সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল। নিষিদ্ধ করেছিল সকল সরকার-বিরোধী পত্র-পত্রিকা। প্রতিষ্ঠিত করেছিল একমাত্র রাজনৈতিক দল বাকশাল। তাদের কাছে ইসলামী সংগঠন যেমন অসহ্য ছিল, তেমনি অসহ্য ছিল কোরআনের আয়াত ও ইসলাম শব্দটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে তারা কোরআনের আয়াত তুলে দিয়েছিল। রেডিও-টিভি সম্প্রচারে বন্ধ করেছিল কোরআনের দরস। যেসব প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে ইসলাম শব্দটি ছিল সেটিও তারা তুলে দিয়েছিল, ফলে তাদের আমলে ঢাকার নজরুল ইসলাম কলেজ হয়ে যায় নজরুল কলেজ। তাদের চেতনা ও রাজনীতির চরিত্র আজও অভিন্ন। দিন পাল্টে গেলেও তাদের মন পাল্টায়নি। সমাজ ও রাষ্ট্র জুড়ে ইসলামের বিজয় বা প্রতিষ্ঠার প্রতি যে কোন অঙ্গিকার তাদের কাছে আজও সাম্প্রদায়িকতা।

এমন বিশ্বাসকে তারা বলছে মৌলবাদ। বলছে সন্ত্রাস। ফলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মার্কিনীরা যে যুদ্ধ শুরু করেছে সে যুদ্ধে মার্কিনীদের সাথে যোগ দিতে বাংলাদেশের সেক্যুলার পক্ষটি দু'পায়ে খাড়া। তাদের অটুট অঙ্গিকার, ইসলামের পুনঃজাগরণকে যে কোন মূল্যে তারা রুখবে। এলক্ষ্যে তারা কোয়ালিশন করতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতসহ সকল অমুসলিম শক্তির সাথে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলাম পরাজিত সে ঔপনিবেশিক কাফেরদের শাসনামল থেকেই। আইন-আদালত, অর্থনীতি, প্রশাসন থেকে আল্লাহর আইন নির্মূল হয়েছে সে আমল থেকেই। তাই দেশটিতে ব্যাভিচারও শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়, সূদও হারাম নয়, সিনেমা-নাটকের নামে অশ্লিলতাও নিষিদ্ধ নয়। দেশে বার বার নির্বাচন হলেও ইসলামের যে পরাজিত দশা সেটি দূর হচ্ছে না। প্রতি নির্বাচনেই এক পক্ষ জিতছে, অন্য পক্ষগুলো হারছে। কিন্তু কোন বিজয়ী পক্ষই ইসলামকে বিজয়ী করার কোন উদ্যোগই নেয়নি। তারা সবাই ইসলামের পরাজিত অবস্থাকেই অব্যাহত রেখেছে। বরং কেউ কেউ সে পরাজয়কে আরো গভীরতর ও কদর্যতর করার চেষ্টা করছে। আর এবারের বিজয়ী পক্ষটি সে শেষোক্ত লক্ষ্যেই বদ্ধপরিকর। অথচ ঈমানদার মুসলমানদের বাঁচার স্বপ্নটি ভিন্নতর। দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতির বহু বিষয় নিয়েই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু যা নিয়ে সামান্যতম বিরোধ নেই তা হল, ইসলামের বিজয় নিয়ে। কারণ, ইসলামকে পরাজিত দেখার মধ্যে আনন্দ থাকতে পারে একমাত্র কাফেরের। কোন মুসলমানের নয়। কে মুসলমান আর কে কাফের সেটির বিচার ব্যক্তির নাম দেখে হয় না। মুখে কে কি বললো তা থেকেও নয়। বরং সে বিচার হয়, যেটি সে অন্তর থেকে চাইলো বা বাস্তবে করলো তা থেকে। আর মহান আল্লাহ তো মানুষের মনের ভাষা বুঝেন এবং কর্মও দেখেন। মুসলমানের জীবনে প্রধানতম ভাবনা ও অঙ্গিকার হল, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার ভাবনা। তার চেতনায় সবসময় কাজ করে কি করে সে তার সামর্থকে সে কাজে বিনিয়োগ করবে। কারণ মুসলমান হওয়ার অর্থ, রাজনীতির খেলার মাঠে দর্শক হওয়া নয়, বরং জ্বিহাদের ময়দানে সক্রিয় মোজাহিদে পরিণত হওয়া। একাজে আত্মনিয়োগ ছাড়া একজন মুসলমান কি মহান আল্লাহকে খুশি করতে পারে? নামায-রোযা বা দান-খয়রাতে যেমন নিয়ত বাঁধতে হয়, তেমনি নিয়ত বা লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয় বাঁচা-মরা ও জীবন ধারনের ক্ষেত্রেও। ইবাদতের নিয়ত না থাকলে কোন ইবাদতই যেমন ইবাদত হয় না, তেমনি উচ্চতর নিয়ত না থাকলে বাঁচাটিও পশুদের বাঁচা থেকে ভিন্নতর হয়না। বোখারী শরিফের প্রথম হাদীসটি হল, "সকল কাজের মর্যাদা বা মূল্যমান নির্ধারিত হবে তার নিয়ত থেকে।" আর কাজ নিয়েই তো মানুষ। তাই মানুষের মর্যাদাও নির্ধারিত হয় তার বাঁচবার নিয়ত থেকে। একজন কাফের যে নিয়তে বাঁচে, মুসলমান সে নিয়তে বাঁচে না। মানুষের বাঁচবার সে উচ্চতর নিয়ত শেখাতেই পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহতায়ালা আয়াত নাযিল করেছেন এবং বলেছেনঃ "বলুন (হে মহম্মদ)! আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন-ধারণ ও মরণ –সব কিছুই সেই বিশ্ব-প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য।" -সুরা আল-আনয়াম, আয়াত ১৬২।

তাই শুধু মহান নবীজী (সাঃ)কে তাঁর বাঁচা-মরার নিয়ত শেখাতে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়নি। নাযিল হয়েছিল সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে। মানুষ কেন বাঁচবে, কেনই বা লড়াই করবে, কেনই বা প্রাণ দিবে –সেটি প্রতিটি মানুষের জীবনেই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বরং জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো এটি। কোন ব্যক্তির পক্ষে তার সীমিত কান্ড-জ্ঞান নিয়ে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর বের করা কঠিন। ফলে মানব জীবনে সবচেয়ে বড় ভূল হয় এ ক্ষেত্রেটিতে। আর তাতে ব্যর্থ হয় সমগ্র জীবনের বাঁচাটাই। মানুষ তখন প্রাণ দেয় ইতিহাসের হিটলার ও চেঙ্গিজদের বিজয়ী করতে বা কোন সাম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী ও বর্ণবাদী যুদ্ধে। এভাবে তার বাঁচা বা মরাটি তখন পশুদের চেয়েও নিকৃষ্টতর হয়। কারণ পশু নিজে শিকার ধরলেও অন্যের হাতে গণহত্যা, জুলুম-নির্যাতন বা দেশ-দখলের হাতিয়ারে পরিণত হয় না। আল্লাহতায়ালা এমন মানুষদের উদ্দেশ্যেই বলেছেন, "উলায়িকা কা আল-আনয়াম, বাল হুম আদাল।" অর্থঃ এরাই হল তারা যারা গবাদী পশুর ন্যায়, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশগণ তো তাদের সেনা বাহিনী পূর্ণ করেছে এসব মানুষ রূপী পশুদের দিয়েই। মানুষ তাদের বাহিনীতে ভাড়ায় খেটেছে। আজও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজুড়ে আধিপত্য

জমিয়েছে এসব পশু বা মানুষের সাহায্য নিয়ে। মহান আল্লাহতায়ালাকে তাই মানব জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিতেও পথ দেখাতে হয়েছে। জীবনের নীতিটি কি হওয়া উচিত সেটি তিনি স্পষ্টতর করেছেন। বস্তুতঃ সুরা আনয়ামের উপরুক্ত আয়াতটিতে মানুষের জন্য তাঁর পছন্দের সে নীতিটিকে তথা জীবনধারণের সে লক্ষ্যটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর মুসলমানের দায়িত্ব হল, আল্লাহর পক্ষ থেকে বেঁধে দেওয়া সে নীতিটিকে নিজের নীতি রূপে গ্রহণ করা। অন্যথায় তার বাঁচাটি হবে ভ্রান্ত পথে বাঁচা, তথা জাহান্নামের পথে বাঁচা।

প্রকৃত ঈমানদার তাই নিছক বাঁচার জন্য বাঁচে না। সে বাঁচে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত লক্ষ্যটি পূরণ করার লক্ষ্যে। নিছক আহারের সন্ধান, ঘরবাধা বা বংশ বিস্তারের লক্ষ্য তো পশুরও থাকে। এরূপ লক্ষ্যে জীবন-ধারণ তাকে পশু-পাখি ও পোকা-মাকড় থেকে ভিন্নতর করে না, শ্রেষ্ঠতরও করে না। কোন রাষ্ট্রেই সকল নাগরিকের সম-মর্যাদা থাকে না। মর্যাদা নির্ধারিত হয় নাগরিকদের কাজের মর্যাদা থেকে। যে ব্যক্তিটি তার জীবনের সকল সামর্থ ব্যয় করে নিছক নিজের বেঁচে থাকা ও সুখ-সাচ্ছন্দের খাতিরে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে যার কোন আগ্রহ বা সামর্থই অবশিষ্ঠ থাকে না -তাকে কি সে ব্যক্তির সম-মর্যাদা দেওয়া যায় যে তার সময় ও সামর্থ ব্যয় করে, এমনকি প্রাণও বিলিয়ে দেয় রাষ্ট্রের কল্যাণে? এ দুই ব্যক্তি কখনই কোন রাষ্ট্রে সম-মর্যাদা পায় না। ইসলামে শহিদের মর্যাদা এজন্যই অতুলনীয়। তারা তো জানমাল কোরবানী করে আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ে। সে বিজয়ে শান্তি নেমে আসে সমাজ ও রাষ্ট্র জুড়ে। আল্লাহপাক তাদেরকে মৃত্যুর পরও জীবিত রাখেন এবং পুরস্কৃত করেন জান্নাত দিয়ে। আল্লাহপাক তো চান, তার প্রতিটি বান্দাহ সে মহান লক্ষ্য নিয়ে বাঁচুক, এবং অর্জন করুক সে মহান মর্যাদা। প্রতিটি সমাজ ও রাষ্ট্র জুড়ে প্রতিনিয়ত যা ঘটে তা হলো দুটি বিপরীত-মুখী জীবন লক্ষ্য নিয়ে বাঁচার যুদ্ধ। এর একটি মহান আল্লাহর লক্ষ্যে, অপরটি গায়রুল্লাহ তথা শয়তানের লক্ষ্যে। প্রথমটি মহা-সাফল্যের। এ পথ জান্নাতের। আর দ্বিতীয়টি চরম ব্যর্থতার -ব্যক্তিকে এটি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। তাই কোরআনে বলা হয়েছে, "যারা ঈমানদার তাঁরা লড়াই করে আল্লাহর লক্ষ্যে, আর যার কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের লক্ষ্যে।"

এখন প্রশ্ন হল, বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় কীরূপে সম্ভব? এটি কি নির্বাচনের মাধ্যমে? নির্বাচনের মাধ্যমে যারা বাংলাদেশে ইসলামের বিজয়ের স্বপ্ন দেখে, বার বার শোচনীয় পরাজয়ের পর অন্ততঃ তাদের বোধোদয় হওয়া উচিত। নির্বাচন সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার নয়। এমনকি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সফল মাধ্যমও নয়। অতীতে কোন দেশেই এ পথে কোন সমাজ বিপ্লব আসেনি। আসেনি মানুষের মন-মনন, রুচিবোধ, বাঁচবার সংস্কৃতিতে পরিবর্তন। বরং নির্বাচনে দেশ-শাসনের অধিকার পায় তারাই যারা সমাজের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। তাই সূদ, ঘুষ ও দূর্নীতি যে সমাজে প্রবল ভাবে বিজয়ী সে সমাজের নির্বাচনেও সূদখোর, ঘুষখোর ও দূর্নীতিবাজরাই বিজয়ী হয়। যেমন সবচেয়ে বড় ডাকাতটিই ডাকাত পাড়ায় সর্দার নির্বাচিত হয়। মক্কার দূর্বৃত্ত-কবলিত সমাজে আবু জেহেল ও আবু লাহাবের ন্যায় দুর্বৃত্ত নেতা হবে সেটিই কি স্বাভাবিক ছিল না? তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল নবীজী (সাঃ)র মত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকে। মশা-মাছি কখনই ফুলের উপর বসে না, তারা তো আবর্জনা খুঁজে। তেমনি অবস্থা দূর্নীতিতে ডুবা জনগণের। সমাজে নবীজী (সাঃ)র ন্যায় মহা-মানবকে নেতা রূপে গ্রহণ করার সামর্থ হাওয়ায় নির্মিত হয় না। এজন্য জনগণের চেতনায় ঈমানের প্রচণ্ড বল চাই। মক্কার মানুষের সে সামর্থ ছিল না। তাই নবীজী(সাঃ)কে প্রত্যাখ্যান করে তারা নিজেদের সে অযোগ্যতাই প্রমাণ করেছিল। এখানে ব্যর্থতা নবীজী(সাঃ)র ছিল না। ব্যর্থতা ছিল মক্কার মানুষের। কথা হল, বাংলাদেশে এরূপ মাছি-চরিত্রের মানুষের সংখ্যা কি কম? সাম্প্রতিক কালে দুর্বৃত্তিতে ৫ বার বিশ্ব-শিরোপা পাওয়ার মধ্য দিয়ে তারা কি প্রমাণ করেনি, এমন মাছি-চরিত্রের মানুষের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বমাঝে বাংলাদেশেই সর্বাধিক? এটি তো বিবেকে কাঁপন ধরানোর মত বিষয়। দেহের রোগ লুকিয়ে রেখে লাভ নাই। বরং চিকিৎসার স্বার্থে সে রোগের বিষয়টি যতটা পূর্ণভাবে ও সত্যভাবে বলা যায় ততই ভাল। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই বলেছিলেন, "হে বিধাতা! সাত কোটি প্রাণীরে রেখেছো বাঙ্গালী করে, মানুষ করনি।" রবীন্দ্রনাথের এ উচ্চারণের মধ্যে ছিল বাঙ্গালীর মাঝে বিদ্যমান রোগটি নিয়ে অকপটে কিছু বলার আকুতি। রবীন্দ্রনাথ সেদিন বাঙ্গালীর যে রোগ নিয়ে প্রচণ্ড মনোবেদনায় ভুগছিলেন সেটি হলো, মানুষ রূপে বেড়ে উঠার ব্যর্থতা। আর আজ তার সাথে যোগ হয়েছে আরেক মারাত্মক রোগ, এবং সেটি হল দুর্বৃত্তি। আর এ দুটি রোগ পরস্পরে সম্পৃক্ত, প্রথমটি থেকেই জন্ম নিয়েছে দ্বিতীয়টি। কথা হল, এমন একটি দুর্বৃত্তকবলিত দেশে স্বয়ং কোন পয়গম্বর নেমে আসলেও তাঁর পক্ষে কি নির্বাচনী বিজয়-লাভ সম্ভব? এখানে তো হোসেন মুহম্মদ এরশাদের মত আদালতে প্রমাণিত ও শাস্তিভোগী দুর্বৃত্তরাই বার বার বিপুল ভোটে জিতবে। মক্কায় বার বার নির্বাচন হলেও নবীজী (সাঃ) কি সেসব নির্বাচনে একবারও

জিততেন? অথচ মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র চিত্রটাই পাল্টে যায়। তখন হাজারো বার নির্বাচন হলেও তাঁকে কি কেউ একটিবারও পরাজিত করতে পারতো? কারণ, ইতিমধ্যে সমগ্র আরব জুড়ে অভাবনীয় বিপ্লব ঘটে গেছে। সে বিপ্লবে পাল্টে গিয়েছিল শুধু তাদের ধর্মীয়-বিশ্বাসই নয়, বরং জীবন ও জগত নিয়ে তাদের সকল ধ্যান-ধারণা। পাল্টে গিয়েছিল প্রকৃত যোগ্য মানুষের ধারণা। আমূল বিপ্লব এসেছিল তাদের আচার-আচরণ, রুচিবোধ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে। আরবের এককালের মাছি-চরিত্রের মানুষগুলো তখন আর আবর্জনার সন্ধান করেনি, নিজেরাই তখন বিশুদ্ধতা অর্জন করেছিল। মাছি-চরিত্রের বাদবাকি মানুষগুলো তখন আবর্জনার স্তুপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে এটিই হলো নবীজী (সাঃ)র সূন্নত।

নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় আনা বা শরিয়তের প্রতিষ্ঠা করা অনেকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে কমিউনিস্টদের বিজয়ের মত। নির্বাচন আসে সেদেশের প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র, আইন ও রাজনৈতিক রীতি-নীতির বৈধতা মেনে নিয়ে। এমন নির্বাচনে সরকার পরিবর্তিত হয়, কিন্তু তাতে পরিবর্তন আসে না দেশের আইন বা শাসনতন্ত্রে। ঘটে তা সেটি পুরোনো ঘরে রঙ-চং লাগানোর মত। শাসনতন্ত্র একটি দেশের নির্বাচিত সরকারের হাত পা যে কতটা কঠোর ভাবে বেঁধে দেয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল তুরস্ক। ইসলামের ফরয বিধানগুলো বাস্তবায়ন দূরে থাক, নির্বাচনের মাধ্যমে বার বার ক্ষমতায় গিয়েও সেদেশের ইসলামপন্থিগণ ছাত্রীদের মাথায় রুমাল বাধার স্বাধীনতাটুকুও ফিরিয়ে দিতে পারছে না। ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার পথে প্রচন্ড বাধা হয়েছে সে দেশের ধর্মবিরোধী সেক্যুলার আইন। ফলে সেদেশে ব্যাভিচার হয়, প্রকাশ্য মদ্যপাণ হয়, প্লেবয় ম্যাগাজিনের এডিশনও ছাপা হয়, সর্বোপরি ইসরাইলের সাথে যৌথ সামরিক মহড়াও হয়। বাংলাদেশের নির্বাচনে ইসলামপন্থিগণ যদি জয়লাভও করে তবে কি তারা সমাজ পরিবর্তনের পথে বেশী দূর এগুতে পারবে? রেজা শাহের আমলে ইরানে বহুবার নির্বাচন হয়েছে। কিন্তু সে নির্বাচনে ইরানের ইসলামপন্থিরা অংশ নেয়নি। আর অংশ নিলেও তারা কি জিততে পারতো? এবং জিতলেই কি তারা দেশটির তাগুতী শাহ ও তার বহু দিনের প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থাকে পাল্টাতে পারতো? গ্রেট-ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী রূপে কোন আলেম বা আয়াতুল্লাহকে বসালেই তিনিই বা কি করতে পারতেন? সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চেতনারাজ্য জুড়ে ব্যাপক বিপ্লব না এনে নিছক মন্ত্রীত্ব লাভ বা এমপি হওয়াতে ইসলামের কল্যাণ নেই। রেলগাড়ী শুধু বিছানো রেলপথ দিয়েই চলতে পারে, সে পথ থেকে ছিটকে পড়লে আর এগুতে পারে না। তেমনি ঘটে একটি নির্বাচিত সরকারের বেলায়ও। তাকে বাধাধরা নিয়ম মেনে চলতে হয়, এজন্য নির্বাচনে বিজয়ের পর কসমও খেতে হয়। ফলে বৈধ অধিকার থাকে না বিপ্লব ঘটানোর। নির্বাচনে বিপ্লব ঘটানোর সে ম্যান্ডেট কোন সরকারই পায় না। অথচ সে ক্ষমতা থাকে বিপ্লবী সরকারের। তাই ইরান, চীন, রাশিয়া বা কিউবাতে রাষ্ট্র জুড়ে যেরূপ ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল সেটি কি কোন নির্বাচিত সরকার ভাবতে পারে? কারণ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় রাজপথে জনগণের প্রচন্ড বিদ্রোহে ও বিপুল রক্তদানে। এমন গণবিপ্লবের ক্ষমতাই আলাদা।

বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতিতে যারা নির্বাচনে নামে তারা তো প্রতিযোগিতায় নামে প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক বিধি ও জনগণের মাঝে বিরাজমান রাজনৈতিক দর্শন ও সংস্কৃতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে। আর ইসলাম থেকে বিচ্যুতির শুরু হয় মূলতঃ এখান থেকেই। বাংলাদেশে যে শিরকটি প্রবল ভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সেটি মুর্তিপুজা নয়। সে শিরক শুধু মুশরিকদের মাঝেও সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা হল গণতন্ত্রের নামে এমন এক বিশ্বাস যার মূল কথা, “জনগণই ক্ষমতার উৎস।” এবং সে সাথে “জনগণের সার্বভৌমত্ব”-এর ধারণা এবং “আইন প্রণয়নে পার্লামেন্টের নিরংকুশ ক্ষমতার বিষয়।” অথচ মুসলমান হওয়ার অর্থই হল, আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের উপর থাকতে হবে একমাত্র মহান আল্লাহর পূর্ণ-সার্বভৌমত্ব। এক্ষেত্রে আপোষ চলে না। আপোষ হলে ঈমানই থাকে না। আল্লাহর আইনকে দূরে ঠেলে দিয়ে নিজেরাই পার্লামেন্টে আইন নির্মাণে উদ্যোগী হওয়া তো আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ তো আইনদাতা হিসাবে আল্লাহর রাব্বানিয়াতের বিরুদ্ধে। এটি তো সুস্পষ্ট কুফরি। কোন ঈমানদার ব্যক্তি কি এমন বিদ্রোহ ও এরূপ কুফরিতে অংশ নিতে পারে? এমন বিদ্রোহ তো এমনকি মুঘল সম্রাটরাও করেনি। করেনি বাংলার কোন মুসলিম শাসক। আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে প্রথম বিদ্রোহ করেছিল ব্রিটিশ শাসকেরা। আর বাংলাদেশের সেক্যুলার শাসকগণ আজও সে বিদ্রোহকে অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের সেক্যুলার পক্ষটি এজন্যই ব্রিটিশসহ সমগ্র কাফের শক্তির এতটা পছন্দের। ইসলামপন্থি রাজনৈতিক দল ও উলামাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা যে দেশের জনগণকে এ প্রকান্ড কুফরির বিরুদ্ধে সতর্ক করতে পারেনি। অন্যদের সতর্ক কি করবে, তারা নিজেরাও সেটি যথার্থ ভাবে বুঝতে পারেনি।

ঈমানদারের ভয় জনগণের ভোট হারানো নিয়ে নয়, বরং ঈমান হারানো নিয়ে। সে সাথে আল্লাহর সাহায্য ও হেদায়াত হারানো নিয়ে। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিটি অবাধ্যতা সে অবাধ্য ব্যক্তিটিকে দূরে সরিয়ে নেয় মহান আল্লাহর হেদায়াত থেকে। এবং তাকে নিকটবর্তী করে শয়তানের। সেটিরই বর্ণনা পবিত্র কোরআনে এসেছে এভাবে। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, "যারা বিশ্বাস স্থাপন করেনা, তাদের বন্ধুরূপে শয়তানদেরকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।"- সুরা আল-আ'রাফ, আয়াত -২৭। তিনি আরো বলেছেন, "এবং যারা কুফর করিলো, তাদের বন্ধু হলো শয়তান; তাদেরকে সে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। তারাই হলো জাহান্নামের বাসিন্দা, সেখানে তারা চীরকাল থাকবে।"-সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৭। কথা হলো, কুফরির অর্থ কি? এর অর্থ কি সীমাবদ্ধ নিছক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করার মধ্যে? কুফরির নানা রূপ এবং মানুষের জীবনে এটি আসে নানা ভাবে। মক্কার কাফেরগণ আল্লাহকে শুধু বিশ্বাসই করতো না, নিজেদের সন্তানদের নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুর রাহমানও রাখতো -যার অর্থ আল্লাহর দাস। কিন্তু তারপরও তারা কাফের রূপে চিহ্নিত হয়েছে। মুসলমান হওয়ার জন্য যেটি জরুরী সেটি নিছক আল্লাহর ও তাঁর রাসূলকে বিশ্বাস করা নয়, বরং আল্লাহর দ্বীনের সামগ্রীক বিজয় বা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপোষহীন অঙ্গিকার ও আত্মত্যাগ। প্রকৃত ঈমানদারের কাছে অতিশয় অসহ্য হলো আল্লাহর দ্বীনের পরাজয়। এক্ষেত্রে সামান্য আপোষমুখিতাই হল কুফর। নবীজী (সাঃ) ও তার সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সামান্যতম আপোষ করেননি। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ন্যায় দয়ালু ব্যক্তি তার খেলাফতকালে কাফের রূপে তাদের বিরুদ্ধে হত্যার শাস্তি দিয়েছেন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস ও নামায-কালাম পড়লেও যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল।

গণতন্ত্রের নামে অন্য যে জাহিলিয়াতটি মুসলিম দেশে জনপ্রিয়তা পেয়েছে সেটি হল, "জনগণ কখনই ভূল করে না"। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তারা বলে, "জনগণ একাত্তরেও ভূল করেনি এবং এখনও করছে না।" জনগণ যেন ফেরেশতা। নির্বাচনী বিজয়কে তারা ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব যাচাইয়ে একটি মাপকাঠি রূপে ব্যবহার করে। সে মাপকাঠিতেই শেখ মুজিবকে তারা বলছে ইতিহাসের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী। কারণ একাত্তরে সবচেয়ে বেশী ভোটে বিজয়ী তিনিই একমাত্র বাঙালী। অথচ তারা একথা বলে না, ইতিহাসে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থণ পেয়েছে এককালের নমরুদ ও ফেরাউন। জনগণ শুধু সমর্থনই দেয়নি তাদের পক্ষে তারা যুদ্ধ করেছে, প্রাণও দিয়েছে। অপর দিকে জনসমর্থণ হারিয়ে পথে পথে ঘুরেছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত মুসা (আঃ)। বহু শত বছর ধরে দিন-রাত বুঝিয়েও গণসমর্থণ পাননি হযরত নূহ (আঃ)। গণসমর্থণ না থাকায় রাতের আঁধারে লুকিয়ে মাতৃভূমি ছাড়তে হয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী হযরত মহম্মদ (সাঃ)কে। দুর্বৃত্তরা সেদিন মক্কায় প্রবল ভাবে বিজয়ী হয়েছিল, সে বিজয় নিয়ে আজকের ন্যায় সেদিনও ইসলামের বিপক্ষশক্তি মহা-বিজয়ের উল্লাস করেছিল। তারা একথাও ভূলে যায়, বিপুল জনসমর্থণ পেয়েছে দুর্বৃত্ত হিটলার, জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার। তেমনি পেয়েছে একদলীয় বাকশালের প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলাদেশে মানবাধিকারের হন্তা শেখ মুজিব। তাই জনসমর্থণ দিয়ে কি কারো সততা, যোগ্যতা বা অন্য কোন মানবিক গুণ যাচাই হয়?

প্রশ্ন হলো, ইসলামের বিজয়-সাধনের পথ কোনটি? পথ একটিই, আর সেটি হলো নবীজী (সাঃ) দেখানো পথ। নবীজী (সাঃ) শুধু নামায-রোযার পদ্ধতিই শিখিয়ে যাননি, শিখিয়ে গেছেন সমাজ বিপ্লবের পথও। তাছাড়া নামায-রোযার চেয়ে এটিই তো জটিলতম ইবাদত। তাই এ ইবাদত পালনের কোন সুন্নতী তরীকা রেখে না গেলে সেটি মানব জাতির জন্য আরেক বিপর্যয়ের কারণ হত। মানুষ তখন তাদের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা নিয়ে ইসলামী বিপ্লবের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নামতো। আর এতে ব্যাপক অপচয় ঘটতো মানুষের অর্থ, মেধা, সময় ও রক্তের। আজও অনেক দেশে সেটিই হচ্ছে। ইসলামী বিপ্লবের শুরু হতে হবে ব্যক্তির চিন্তারাজ্য থেকে। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল কোরআন। কোরআনের জ্ঞানের আলোকে গভীর বিপ্লব আনতে হবে ব্যক্তির জীবনদর্শনে। হাদীস পাকে বলা হয়েছে, "সবচেয়ে উত্তম জ্বিহাদ হলো নিজের নফসের বিরুদ্ধে জ্বিহাদ।" সব জ্বিহাদের শুরু মূলতঃ এখান থেকেই। তাই এ জ্বিহাদে বিজয়ী ব্যক্তির সংখ্যা যে দেশে বৃদ্ধি পায়, একমাত্র সে দেশেই শয়তানি শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামকে বিজয়ী করার চুড়ান্ত জ্বিহাদটিও শুরু হয়। আর যে দেশে সে চুড়ান্ত জ্বিহাদটিই শুরু হয়নি, বুঝতে হবে সে দেশে নফসের বিরুদ্ধে বিজয়ী মোজাহিদের সংখ্যাও তেমন একটি নেই। কারণ নফসের বিরুদ্ধে বিজয়ী মোজাহিদ কখনই রাষ্ট্র ও সমাজে আল্লাহর দ্বীনের পরাজয় ও অপমাণ মেনে নিতে পারে না। ফলে জ্বিহাদ সেখানে অনিবার্য। এবং সে চুড়ান্ত জ্বিহাদের পরিণতিতেই বিজয়ী হয় আল্লাহর দ্বীন। তাই একটি দেশে লক্ষ লক্ষ মসজিদ-মাদ্রাসা থাকাটি বড় কথা নয়। বড় কথা নয় রোযাদার বা মুসল্লীর সংখ্যাও। তাবলিগ জামাতের ইজতেমায় কত লক্ষ মুসল্লী জমা হলো -সেটিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং অতি গুরুত্বপূর্ণ হলো সে দেশে ক'জন এরূপ আত্মবিজয়ী মোজাহিদ সৃষ্টি হলো সেটি। বাংলাদেশে আল্লাহর দ্বীন আজ পরাজিত। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের

দেশে বিজয়ী আদর্শ রূপে যেটি দেশের রাজনীতি, প্রশাসন, আইন-আদালত ও সংস্কৃতিতে জেঁকে বসে আছে সেটি ইসলাম নয়। সেটি সেক্যুলারিজম। এবং সেক্যুলারিস্টদের আনন্দ ইসলামের পরাজয়ে। তাদের কারণে আইন-আদালতে আল্লাহর শরিয়তি আইনের প্রতিষ্ঠা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় সুদী ব্যাংকের উৎখাত। সম্ভব নয় পতিতাবৃত্তির ন্যায় পেশাদারি ব্যাভিচারের নির্মূল। সম্ভব নয় ঘুষ, সরকারি তহবিল তছরুফ, চুরি-ডাকাতি ও সন্ত্রাসের ন্যায় নানাবিধ পাপাচারের উচ্ছেদ।

যারা ইসলামের পক্ষের শক্তি, নিজেদের ব্যর্থতা নিয়ে তাদের আত্মসমালোচনা হওয়া উচিত। যে পথে আসছে অবিরাম ব্যর্থতা সে পথে হাজার বছর চললেও কি সফলতা আসবে? চলা থামিয়ে তাদের ভাবা উচিত যে পথে তারা চলছে সেটি সঠিক কি তো? দেশে ইসলামের বিজয় আনার আগে ব্যক্তি-জীবনে ইসলামের বিজয় আসা উচিত। শুরু হওয়া উচিত নফসের বিরুদ্ধে জ্বিহাদ। অথচ এক্ষেত্রে ব্যর্থতা যে প্রকট সে প্রমাণ কি কম? আত্ম-বিজয়ী তথা নিজের নফসের উপর বিজয়ী মোজাহিদ গড়ার সফল পদ্ধতি থাকলে অবশ্যই শুরু হত আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লড়াই। কিন্তু বাংলাদেশে সে কাজটি হয়নি। এটি বাংলাদেশের মুসলমানদের ধর্মপালনের এক নিদারুণ ব্যর্থতা। যে কোন ধর্মপ্রাণ মানুষকে এ ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে হবে। প্রশ্ন হলো, ১৫ কোটি মুসলমানের দেশে ক'জন মুসলমান এমন আছে যারা পবিত্র কোরআনের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত একবার অর্থসহ বুঝে পড়েছে? এবং পাঠের সাথে তার উপর চিন্তা-ভাবনাও করেছে। কোরআন মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বিপ্লবী গ্রন্থ। এ কিতাব পড়লে চিন্তাশীল পাঠক বুঝতে পারে এ কিতাবের লেখক আর কেউ নন, লেখক সর্বশক্তিময় মহান আল্লাহ। এটিও সে বুঝতে পারে, এ মহান লেখকের প্রতিটি কথা তার নিজেকে উদ্দেশ্য করে লেখা। তখন তার মনে প্রচণ্ড আগ্রহ বাড়ে আল্লাহর সে নির্দেশাবলীর অনুসরণে। তখন আমূল বিপ্লব শুরু হয় শুধু তার মন-জগতে নয়, বরং সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে। একারণেই নবীজীর আমলে সাহাবাগণ এ কিতাব পড়তে পড়তে অঝোরে কাঁদতেন। আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠতো তাদের ক্বালব। পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক মোমেনের সে বাস্তব চিত্রটি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে, "ঈমানদার হচ্ছে একমাত্র তারাই, যাদের ক্বালব ভয়ে কেঁপে উঠে যখন তাদেরকে আল্লাহর নাম শুনানো হয়। এবং যখন তাদেরকে আল্লাহর আয়াত তেলাওয়াত করে শুনানো হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। এবং তারা তাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর ভরসা করে।" –সুরা আনফাল, আয়াত ২। -"এবং তারাই হচ্ছে সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান, রয়েছে মাগফেরাত এবং মর্যাদাপূর্ণ রিযিক।" –সুরা আনফাল, আয়াত ৩।

তাই ইসলামের বিজয় বাড়াতে হলে কোরআনের চর্চা বাড়াতে হবে। এছাড়া বিকল্প পথ নেই। দলীয় নেতা-কর্মী, দলীয় তহবিল বা দলীয় অফিসের সংখ্যা বাড়িয়ে এ কাজ সম্ভব নয়। তবে কোরআন চর্চার অর্থ নিছক কোরআন পাঠ নয়, বরং সেটি হলো কোরআনের জ্ঞানের গভীর আত্মস্থ্যকরণ। এজন্য সম্ভব হলে কোরআনের ভাষা আরবীকেও শিখতে হবে। কারণ কোরআনের অনুবাদ পাঠে হৃদয় ভয়ে কেঁপে উঠবে -সে সম্ভবনা কম। কারণ, যিনি অনুবাদ করেন তিনি তো মানুষ। আর কোরআনের রচয়িতা তো মহান আল্লাহ। আল্লাহর ভাষা, ভাব ও বর্ণনাভঙ্গির অনুবাদ কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব? এটি সম্ভব নয় বলেই বহু আলেম কোরআনের অনুবাদকে অসম্ভব গণ্য করেছেন। যারা কোরআন বুঝায় আগ্রহী, তাদের সে কাজটি করতে হবে নিজ উদ্যোগে আরবী ভাষা শিক্ষার মধ্য দিয়ে। অথচ বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় অবহেলা হয়েছে কোরআন ও কোরআনের ভাষা বুঝার কাজে। অথচ প্রাথমিক কালে নিছক কোরআন বুঝার তাগিদে মিশর, আলজেরিয়া, মরক্কো, সূদান, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, সিরিয়া, ইরাকসহ বহু দেশের মানুষ নিজ মাতৃভাষা ছেড়ে কোরআনের ভাষাকে শিখেছে। বাংলাদেশের নাগরিকগণ বিদেশী ভাষা যে শিখছে না তা নয়, শিখছে চাকুরি-লাভ ও ব্যবসায়ীক স্বার্থে। ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে তাদের অনেকে মাতৃভাষাও ভূলছে। তাদের কাছে বিদেশী ভাষা শিক্ষায় গুরুত্ব পাচ্ছে নিছক পার্থিব স্বার্থ হাছিলের লক্ষ্যে। অথচ যে ভাষাটি শিক্ষার সাথে জড়িত অনন্ত-অসীম জীবনে সফলতা লাভের বিষয়, সেটিই গুরুত্ব হারাচ্ছে।

অনেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়াকে ইসলামের বিজয়ের একমাত্র পথ মনে করছে। তাই নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা খরচেও তাদের আপত্তি নেই। অথচ এত টাকা দিয়ে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে খোলা যেতে কোরআন ও আরবী ভাষা শিক্ষার শিক্ষাকেন্দ্র। খোলা যেতে টিভি কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠা করা যেতে বহু পত্রিকা। পৌঁছে দেওয়া যেতে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে বিনামূল্যে কোরআনের অনুবাদ ও ইসলামের উপর লেখা বই। এভাবেই আসতে পারতো জ্ঞানের জোয়ার,

স ৃষ ্টি হতে পারত ো মনরাজ ্যে বিপ ্লব□ আর এমন বিপ ্লব আসলে সে বিপ ্লবী মান ুষটি ইসলামের বিজয় আনতে শ ুধ ু রায়ই দিত না, অর ্থ, শ ্রম, সময় -এমনকি প ্রাণও দিত□ এভাবে প ্রতিটি ব ্যক ্তি পরিণত হতে পারত ো সমাজ বিপ ্লবের শক ্তিশালী পাওয়ার হাউস□ নবীজী (সাঃ) তার ১৩ বছরের মক ্কী জীবনে ত ো সে কাজটিই করছেনে□ একটি ক্ ষ ুদ ্র বীজের মধ ্যে যেমন ল ুকিয়ে থাকে আগামী দিনের বিশাল বটব ৃক ্ষ, তেমনি এক শিশ ুর মনে ল ুকিয়ে থাকে সমাজ বিপ ্লবের বিশাল পাওয়ার হাউস□ ইসলামের বিজয়ের লক ্ষ ্যে যেটি প ্রয়োজন সেটি হল ো, সে পাওয়ার হাউসগ ুল ো সক ্রিয় করা□ আর সে কাজটি হতে পারে একমাত ্র ক োরআন দ ্বারা□ ক োরআনই হল ো মহান আল ্লাহর দেওয়া একমাত ্র সফটওয়ার যা বিস ্ময়করভাবে ক ্ষমতা বাড়ায় ব ্যক ্তির□ এ সফটওয়ার ছাড়া মান ুষ পশ ু থেকে সামান ্যই উপরে উঠতে পারে□ বেশীর ভাগ ক ্ষেত ্রে বরং নীচে নামে□ ঈমান না থাকায়, মানবতা যে কতটা বর ্বর ভাবে পশ ুর চেয়েও নীচে নামতে পারে সে স ্বাক ্ষর ত ো আজকের ফিলিস ্তিনি, আফগানিস ্তান, ইরাক, কাশ ্মীর, বসনিয়া, চেচেনিয়া□ ক ুক ুর-বিড়ালের ম ুখে ভাষা থাকলে আজ ফিলিস ্তিনিরে গাজাতে যা হচ ্ছে তারাও তার নিন ্দা জানাত ো□ কিন ্ত সে সামর ্থ জর ্জ ব ুশ বা বারাক ওবামার নেই□ ম ুখে ভাষা থাকলে অন ্ততঃ ক োন পশ ুই শিশ ু ও বেসামরিক নারীপ ুর ুষ হত ্যাকারি ইসরাইলীদেরে সমর ্থন করত ো না□ কিন ্ত ু মার ্কিন প ্রশাসন সেটিও করছে□ তাদের সে ব ্যর ্থতার কারণ, তাদের মগজে যে সফটওয়ারটি কাজ করছে সেটি শয়তানি সফটওয়ার□ মানবতার বেড়ে উঠার বির ুদ ্ধে এটি এক প ্রচন ্ড বাধা□ অথচ ক োরআনের গ ুণে আরবের নিরক ্ষর মর ুবাসীও ইতিহাসের শ ্রেষ ্ঠ মান ুষে পরিণত হতে পেরেছিল□

ইসলামে সবচেয়ে বড় পাপ হল ো অজ ্ঞতা□ অথচ সে পাপটিই ছেয়ে আছে সমগ ্র বাংলাদেশে জ ুড়ে□ এবং সে অজ ্ঞতা অতি প ্রকটতর হল ো ইসলাম ও ক োরআনকে নিয়ে□ এমন অজ ্ঞতায় আর যাই হ োক ক োন সমাজ-বিপ ্লব হয় না□ তখন সমাজে বেড়ে উঠে না শান ্তি, বিবেকেব োধ ও মানবতা□ যে ক োন সমাজ বিপ ্লবের বড় বড় ম ূল কাজগ ুল হিয় জনগণের কাতার থেকে, দেশের প ্রশাসন থেকে নয়□ এবং সেটি জ ্ঞানবিতরণ ও ব ্যাপক সমাজসেবার মধ ্য দিয়ে□ ইসলামী আন ্দ োলন তখন এক ব ্যাপক সামাজিক আন ্দ োলনে পরিণত হয়□ ব ুদ ্ধিব ৃত ্তির ম ূল কাজটি তি ো সরকারের নয়, দেশের আলমে বা জ ্ঞানী ব ্যক ্তিদের□ অতীতে ক োন কালেই এটি ক োন সরকারি প ্রতিষ ্ঠান থেকে হয়নি□ তাফসির, ইসলামি দর ্শন ও ফিকাহর ন ্যায় ক ্ষেত ্রে যে বিশাল জ ্ঞানভান ্ডার, সেগ ুলী ত ো গড়ে উঠেছে ব ্যক ্তিগত উদ ্য োগে□ অথচ বাংলাদেশের ন ্যায় ১৫ ক োটি ম ুসলমানের দেশে এ কাজটি হয়নি□ নবীজী (সাঃ) ক োরআনের জ ্ঞান বিতরণ করতে গিয়ে মার খেয়েছেনে, তাইয়েফে পাথরের আঘাতে রক ্তাত ্ব হয়েছেনে, বহ ু সাহাবী শহিদও হয়েছেনে□ অথচ বাংলাদেশে বহ ু আলমে অর ্থ না দিলে জ ্ঞান-বিতরণে ম ুখই খ ুলনে না□ ব ুদ ্ধিব ৃত ্তির এ ময়দানটিতে প ্রবল ভাবে কাজ করছে ইসলামের বিপক ্ষ শক ্তি□ তাদের কারণেই বার বার নির ্বাচনী বিজয় ঘরে ত ুলছে দেশের সেক ুলার রাজনৈতিক দলগ ুলি□ এবং সে বিজয়ের ফলেই অসম ্ভব হচ ্ছে ইসলামের বিজয়□ নির ্বাচনে যেটির প ্রতিফলন ঘটে, সেটি তি ো জনগণের চলমান চেতনা বা বিশ ্বাসের প ্রতিফলন□ যে দেশের মান ুষ ক োরআন ব ুঝার স ুয োগই পেল না, জানতে পারল ো না ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক বা মানবিক কল ্যাণের দিক, -তারা ইসলামের পক ্ষে ভ োট দিবে সেটি কি আশা করা যায়? গণতন ্ত ্রে নিয়ম হল, নির ্বাচনে জিততে হলে বিজয় আনতে হবে ভ োটগ ্রহণের আগেই□ সে বিজয়টি আনতে হয় মান ুষের চেতনা-রাজ ্যে ও রাজপথে□ আর সে জন ্য ব ্যাপক ভাবে জিততে হয় ব ুদ ্ধিব ৃত ্তির ময়দানে□ ইসলাম-বির োধী সেক ুলার পক ্ষটি সে বিজয় এনেছে বাংলাদেশে প ্রতিষ ্ঠার বহ ু আগেই□ ১৯৪৭ সালে তাদের ঘটেছিল সর ্বপ ্রথম ও সর ্বশেষ পরাজয়□ এর পর তারা শ ুধ ু জিতেই চলেছে□ ১৯৭০ য়ের নির ্বাচনে ভ োট গ ্রহণের বহ ু আগেই তারা রাজপথ দখলে নিয়েছিল□ তারা পাকিস ্তানপন ্থি ও ইসলামপন ্থিগণকে হটিয়ে দিয়েছিল মিডিয়া ও রাজপথ থেকে□ ব ুদ ্ধিব ৃদ ্ধির ময়দানে এবং সে সাথে রাজপথে এমন একটি বিপ ্লব আনার আগে নির ্বাচনে যাওয়ার অর ্থ নিজেদের শ ্রম, অর ্থ, সময় ও মেধার অপচয়□ এমন প ্রকান ্ড অপচয়ে একটি আন ্দ োলনের শ ুধ ু দ ুর ্বলতাই প ্রকাশ পায় না, ক ্ষতির অংকটিও বাড়ে□ আর বাংলাদেশের ইসলামপন ্থিদের সাথে সেটিই হচ ্ছে□

সমাজ-বিপ ্লবের এ সহজ বিষয়টি মার ্কসবাদীরা ব ুঝেছিল□ তাই রাশিয়া, চীন, কিউবার ন ্যায় ক োন দেশেই তারা নির ্বাচনের রাস ্তা ধরেনি□ বরং□ ধরেছিল সমাজ বিপ ্লবের ধারা□ এ সত ্যটি ব ুঝেছিল ইরানের ইমাম খ োমেনৈী ও তা'র অন ুসারিরাও□ যে ক োন সমাজ-বিপ ্লবের ন ্যায় ইসলামি সমাজ বিপ ্লবেরও ম ূল হাতিয়ার যে জ ্ঞান-সম ্পদ বা ব ুদ ্ধিব ৃত ্তি সেটি নবীজী (সাঃ) নিজ হাতে শিখিয়ে গেছেনে□ নবীজী (সাঃ) তার নব ুয়ত জীবনের প ্রথম ১৩টি বছর ধরে মক ্কায় শ ুধ ু একাজটিই করেছেনে□ এ সময় তিনি ক োন রাজনৈতিক সংঘাত বা প ্রতিয োগিতায় অংশ ননেনি□ নীরবে নির ্যাতন সয়েছেনে এবং সে সাথে অবিরাম জ ্ঞান বিতরণের কাজ করেছেনে□ আর সে জ ্ঞানের আল োকে ঈমানদারদের চরিত ্র গড়েছেনে□ মক ্কী জীবনে সে ১৩ বছরে তিনি দিড়ে শতের বেশী মান ুষের বেশী তৈরী করতে পারেননি□ কিন ্ত ু তারাই ছিলেন ভবিষ ্য□ ম ুসলিম উম ্মাহর ম ূল ইঞ ্জিনি, ছিলেন

সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ। আগুনের উপর শুইয়ে দিয়েও কাফেরগণ তাদের ঈমান বিন্দুমাত্র টলাতে পারেনি। অতি মুষ্টিমেয় হয়েও নিছক গুণের কারণেই তারা জন্ম দিয়েছিলেন ইতিহাসের সর্ব-কালের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্যতার। বিশ্বের ১৫০ কোটি মুসলমানের কাছে আজও এটিই শ্রেষ্ঠ গর্বের। ফেরেশতাদের চেয়েও তারা শ্রেষ্ঠতর পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন। আর তার কারণ ছিল কোরআনী জ্ঞান। জ্ঞানচর্চার কারণে মক্কার সে দরিদ্র মানুষদের প্রত্যেকে পরিণত হয়েছিলেন জগত বিখ্যাত আলেমে। অথচ আজ বাংলাদেশের শত শত মাদ্রাসায় আজীবন জ্ঞানচর্চার পরও সে মাপের কোন জ্ঞানী ব্যক্তি গড়ে উঠছে না। কারণ এসব মাদ্রাসাগুলোতে ফিকাহ, হাদীস বা বিভিন্ন মাজহাবী কিতাব গুরুত্ব পেলেও গুরুত্ব পায়নি কোরআন চর্চা। কোরআন হল চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিতাবের ন্যায় আমল-ভিত্তিক কিতাব। রোগ চিকিৎসায় হাসপাতালে না বসে শুধু বই পড়ে ডাক্তারি শেখা যায় না। তেমনি নেক আমল ও জিহাদে না নেমে কোরআন শিক্ষাও হয় না। তাই কোরআন চর্চা নিছক মাদ্রাসায় বসে হয় না। এজন্য রাজনীতি, সমাজনীতি, মিডিয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ জিহাদেও নামতে হবে। অথচ বাংলাদেশে আলেমদের দ্বারা সেটি হচ্ছে না। আরো সমস্যা হল, বাংলাদেশের ইসলামপন্থিদের মাঝে সে ব্যর্থতা নিয়ে উপলব্ধিও নেই। ফলে বার বার ব্যর্থ হলেও নির্বাচনের পথ ছাড়তে তারা রাজী নয়। অর্ধ বা অল্প শিক্ষিত আলেম বা দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে লাঠিয়ালের কাজ চলে, কিন্তু তা দিয়ে কি সমাজ-বিপ্লব হয়? অথচ তাদের অধিক মনযোগ মূলতঃ তাদের সংখ্যা বাড়ানো নিয়ে। প্রায় বছর চার-পাঁচ আগে একটি গবেষণা চালানো হয়েছিল বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী ছাত্র-সংগঠনটির সদস্যদের উপর। সে গবেষণায় প্রকাশ পায়, এ সংগঠনের সদস্যরা প্রতি-বছর মাত্র দেড়খানা ইসলামী বই পড়েন। কথা হল, এত স্বল্প লেখাপড়া নিয়ে কি কোন সমাজবিপ্লবের জন্ম দেওয়া যায়? গড়ে তোলা যায় কি বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ?

বাংলাদেশের ইসলামী সংগঠনগুলোর মূল ব্যস্ততা কর্মীদের আনুগত্য বাড়াতে। সে সাথে তাদের উপর আরেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রূপে চেপেছে অর্থসংগ্রহের বিষয়টি। দলীয় কর্মীদের গুণাগুণ যাচাইয়ে আনুগত্য, ভোটজোগার ও অর্থসংগ্রহের সামর্থ যতটা গুরুত্ব পেয়েছে ততটা জ্ঞানার্জন পায়নি। ফলে দিন দিন বেড়ে উঠছে বুদ্ধিবৃত্তির ময়দানে ব্যাপক শূণ্যতা। ফলে দেশে ইসলামী পক্ষ থেকে পত্র-পত্রিকায় বের হলেও তাতে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে লেখার লোক নেই। তাদের পত্রিকায় লিখছে চিহ্নিত সেক্যুলারগণ। একই অবস্থা হয়েছিল ১৯৪৭-পরবর্তী মুসলিম লীগের। তারাও পত্রিকা বের করতো, কিন্তু সেগুলি দখলে নিত বামপন্থি সেক্যুলার লেখকেরা। ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশে এক ঝাঁক শক্তিশালী ইসলামী চেতনা সমৃদ্ধ লেখকের জন্ম হয়েছিল। আল্লামা ইকবাল, মাওলানা হালী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, শিবলী নোমানী, আবুল কালাম আযাদ ছিলেন তাদের কয়েকজন। তাদের প্রচেষ্টায় প্যান-ইসলামী চেতনার প্রবল জোয়ার শুরু হয়েছিল সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে। কিন্তু সেটি ১৯৪৭-পরবর্তী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে দ্রুত ভাটার টানে হারিয়ে যায়। ফলে একাত্তরে ভেঙ্গে যায় পাকিস্তান। দেহের পুষ্টির জন্য নিয়মিত খাদ্যগ্রহণ যেমন জরুরী, বুদ্ধিবৃত্তিক সুস্থ্যতা টিকিয়ে রাখার জন্য তেমনি অপরিহার্য হলো অবিরাম জ্ঞানচর্চা। একাজ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে হাদীসে বলা হয়েছে, সারা রাতের নফল ইবাদতের চেয়ে সামান্য ক্ষণের জ্ঞান-চর্চাও শ্রেষ্ঠতর। অথচ সে জ্ঞানচর্চা বাংলাদেশে মাদ্রাসাগুলোতে যেমন হয়নি, হয়নি ইসলামী সংগঠনের দলীয় নেতা-কর্মীদের মাঝেও।

রাজনীতির বাইরে বাংলাদেশে বিশাল জনশক্তি রয়েছে তাবলিগ জামায়াতের। অথচ তারা জ্ঞানচর্চার যে রেওয়াজ চালু করেছেন সেটি ইসলামের বিজয়ের পথে ভয়ানক বাঁধা। তারা যতটা ফাজায়েলে আমল পড়তে ব্যস্ত ততটা ব্যস্ত নয় কোরআন বুঝতে। মসজিদে মসজিদে তারা যে অসংখ্য তা'লীমী মজলিস করে সেখানেও কোরআনের আয়াত পড়ে শুনানো হয় না। বড় জোর কিছু হাদীস পাঠ করে শুনানো হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পাঠ করা হয় ফাজায়েলে আমল। বক্তারা দাড়িয়ে যে ওয়াজ করেন তাতেও শুনানো হয় না কোরআনের আয়াত। অথচ, নবীজী (সাঃ)-র সূন্নত হল তিনি তাঁর বক্তৃতায় বেশীর ভাগ জুড়ে কোরআনের আয়াত শুনাতেন। নিজের কথা সামান্যই বলতেন। কারণ, মহান আল্লাহর চেয়ে আর কে তাঁর দ্বীনকে উত্তম ভাবে বুঝাতে পারেন? ফলে নবীজী (সাঃ)র জুম্মার দুটি খোতবায় প্রায় সবটুকু জুড়ে থাকতো পবিত্র কোরআনের আয়াত। অপরদিকে তাবলিগ দাওয়াত দেয় নিছক নামাযের দিকে। অথচ আল্লাহর নবী (সাঃ) ডেকেছেন পরিপূর্ণ ইসলামের দিকে। সেখানে যেমন নামায-রোযা ছিল, তেমনি জ্ঞানচর্চা, সমাজসেবা, হিযরত এবং জিহাদও ছিল। অথচ তাবলিগ জামায়াতের নেতা-কর্মীদের শেষোক্তগুলীতে কোন মনযোগই নাই। ফলে তাদের জনশক্তি বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু ইসলামের বিজয়ের সম্ভাবনা বাড়ছে না। বরং ইজতেমায় যতই তাদের লোক সমাগম বাড়ছে, দেশজুড়ে ততই বাড়ছে দূর্নীতি। অথচ নবীজীর আমলে ঘটেছিল তার উল্টোটি। তাই প্রশ্ন, তাদের জনশক্তি বাড়াতে ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণটি কোথায়? বরং টঙ্গিতে যে বিশ বা তিরিশ

লাখ মানুষ ইজতেমায় প্রতিবছর যোগ দেয় তারা যদি ঢাকার রাজপথে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে তিন-চার দিনের অবস্থান ধর্মঘট করতো তবে বাংলাদেশের রাজনীতির চেহারাই পাল্টে যেত। বিশাল জনতার রাজপথের অবস্থান নিলে সেটি যে কতবড় শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয় তারই সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো থাইল্যান্ড। সেদেশের মানুষের বিপুল ভোটে নির্বাচিত সরকারকে তারা কয়েক সপ্তাহে হটিয়ে ছেড়েছে। অতীতে সে শক্তি দেখা গেছে ইরান, পোলান্ড, রোমানিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়ায়। সরকার হটাতে সে সব দেশের জনগণকে অস্ত্র হাতে নিতে হয়নি। লাখে লাখে রাজপথে নেমে আসাতেই সেটি শান্তিপূর্ণ ভাবে সাধিত হয়েছে। ইসলাম তো সেটি চায় যে, প্রতিটি ঈমানদার রাজনীতির দর্শক না হয়ে রাজপথে নেমে আসুক। শুধু ভোটদাতা নয়, প্রতিটি ব্যক্তি রাজনীতির অতন্দ্র সৈনিকে পরিণত হোক। আর সেটি হোক আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ে। নবীজী (সাঃ) এর সাহাবীদের মাঝে কেউ কি রাজনীতির নীরব দর্শক ছিলেন? কিছু অন্ধ, বধির ও পঙ্গু ছাড়া সবাই তো হাজির হয়েছিলেন জ্বিহাদের ময়দানে। আর না যাওয়াটি চিহ্নিত হত মোনাফেকীরূপে।

ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মুসলমানদের একতা। একতা ছাড়া কোন আদর্শের বা দলেরই বিজয় আসে না। একতা ছাড়া মুসলমানরা পায় না আল্লাহর সাহায্য। কথা হলো একতার প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব? সেটি সম্ভব নিয়তের পরিশুদ্ধির মধ্য দিয়ে। নিয়ত যদি হয় একমাত্র আল্লাহর দ্বীনের বিজয়, তখন তার একতার পথে বাধা থাকে না। একই গন্তব্যস্থলের দিকে সবাই হাটা শুরু করলে পথটিও তখন অভিন্ন হয়। ভিন্নতা তো আসে তখন, যখন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যটি আলাদা আলাদা। একসাথে বহু হাজার নবী প্রেরীত হলেও তাদের মাঝে কোন বিরোধ হত না। কোন দলের সদস্যপদ দিয়ে তাদের বাধার প্রয়োজন হত না। কারণ তাঁরা তো কাজ করতেন এক অভিন্ন লক্ষ্যে। সেটি একমাত্র আল্লাহকে খুশি করতে, এবং তারই দ্বীনের বিজয়ে। সে লক্ষ্যে তাঁরা তো অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে একতা গড়াকে ফরজ ইবাদত মনে করতেন। একই পরিবারের ভাই-বোনদের বাঁধতে কি বিশেষ কোন সংগঠনের সদস্য করার প্রয়োজন পড়ে? আল্লাহপাক এক মুসলমানকে অন্য মুসলমানের ভাই বলেছেন। নিজের সে ভাইটি যদি ভিন্ন ঘর, ভিন্ন দল, ভিন্ন দেশ বা ভিন্ন মহাদেশে বাস করে তবুও তার সাথে মিলিত হওয়ার আগ্রহটি হবে অতি প্রবল। আর সে প্রবল আগ্রহটিই হলো তার ঈমান যাচাইয়ের মাপকাঠি, যা বলে দেয় তার ঈমানের গভীরতা। যে ব্যক্তির মধ্যে অন্য শহর, অন্য ভাষা, অন্য দল, অন্য দেশ ও অন্য মাজহাবের মুসলমান ভাইয়ের প্রতি প্রবল ভালবাসা নাই, বুঝতে হবে তার মধ্যে ঈমানের গভীরতাও নাই। ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের বন্ধনটি মজবুত করতে কি কোন দলীয় সদস্যপদের প্রয়োজন পড়ে? মুসলমানের ফরয এবাদত তো মুসলমানদের একতাবদ্ধ করা, দল গড়া নয়। ফিরকা গড়াও নয়। দল গড়া যেতে পারে শুধু সে ঐক্যকে শক্তিশালী করার স্বার্থে। কিন্তু দল যখন দলাদলি ও বিভক্তির মাধ্যমে পরিণত হয় তখন সেটি ফিতনায় পরিণত হয়। অথচ মুসলিম বিশ্বে আজ সেটিই হচ্ছে। ফলে দলের সংখ্যা বাড়লেও ঐক্য বাড়েনি। নবীজী (সাঃ)-এর আমলে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কোন দল ও দলের সদস্য-পদের প্রয়োজন পড়েনি। অথচ এরপরও তারা জন্ম দিতে পেরেছিলেন সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত একতা গড়তে। ইমাম খোমেইনী দল ছাড়াই বিরাট বিপ্লব করেছেন। আর বাংলাদেশের ইসলামপন্থিরা দলের পর দল গড়ছে, কিন্তু বহুদূর ছিটকে পড়ছে ইসলামের বিজয় অর্জনের মূল লক্ষ্য থেকে।

বাংলাদেশের মুসলমানদের অনৈক্যের মূল কারণ, মাজহাব, ফিরকা ও দলগত বিভক্তি। বিভক্ত এ মুসলমানেরা চায় নিজ দল, নিজ ফিরকা, নিজ মাজহাবের বিজয়। ফলে আল্লাহর আইন আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হলেও তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনে হাত পড়লে হাজার হাজার মাদ্রাসা শিক্ষক ঢাকার রাস্তা গরম করে তোলেন। অথচ আল্লাহর আইন অপমানিত হলেও তা নিয়ে তাদের সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ নেই। সংসদে বসেও ইসলামী দলের এমপি দাবী তোলে না আল্লাহর আইনের প্রতিষ্ঠা নিয়ে। খেলার মাঠে বা খাওয়ার মজলিসে নানা মাজহাব, নানা দল ও নানা ফিরকার মুসলমান একত্রে বসতে পারলেও তারা একত্রে বসতে পারে না বা কাজ করতে পারে না আল্লাহর দ্বীনের বিজয় নিয়ে। মুসলমানদের জন্য এ এক ভয়ংকর ব্যর্থতা। আর এ ব্যর্থতা তাদের ব্যর্থতা বাড়াবে আখেরাতেও। কারণ, রোজ হাশরের বিচার দিনে এ প্রশ্ন তো উঠবেই, আল্লাহর দ্বীনের বিজয়ে বা উম্মাহর একতার প্রতিষ্ঠায় কতটুকু ছিল তার নিজস্ব প্রচেষ্টা বা কোরবানী? মহান আল্লাহর দরবারে সেদিন তার সাথে কোন দলীয় বা মাজহাবী নেতা খাড়া হবে না, খাড়া হতে হবে তাকে একাকীভাবেই। সেদিন মহান আল্লাহতায়ালা তার উপরই বেশী খুশী হবেন যিনি একমাত্র তারই বিধানকে বিজয়ী করতে সর্বোচ্চ কোরবানী পেশ করেছেন। কতটুকু চেষ্টা করেছেন মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ করতে। আল্লাহতায়ালার কাছে অতি অপছন্দের হলো, তাঁর নিজ বাহিনীতে বিভক্তি। এমন বিভক্তি নিয়ে শুধু পতনই সম্ভব, বিজয় নয়। ইতিহাস তার সাক্ষী। তাই বাংলাদেশে ইসলামের বিজয় আনতে হলে দলগত, ফিরকাগত বা মাজহাবগত বিভক্তির প্রাচীরকে ভাঙ্গতেই হবে। আঁকড়ে ধরতে হবে একমাত্র কোরআনকে। মহান আল্লাহপাক সেটিই বলেছেন পবিত্র কোরআনে, “এবং তোমরা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 11 January 2009 02:34 -

সকলে মিলে আঁকড়ে ধর কোরআনকে, এবং বিভক্ত হয়ো না।”-সূরা আল-ইমরান। একতা স্থাপনের এটিই আল্লাহর নির্দেশিত প্রেসক্রিপশন। মুসলিম সমাজের বর্তমান বিভক্তি দেখে এ কথাটি নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, মুসলমানেরা আল্লাহর সে প্রেসক্রিপশনের সাথে যথাযথ আচরণ করেনি। বরং সেটির সাথে প্রচন্ড গাদ্দারিই করেছে। কোরআনকে আঁকড়ে ধরার অর্থ এ মহান কিতাবকে শক্তভাবে ধরে বার বার চুমু খাওয়া নয়, বরং তা থেকে জ্ঞান লাভ ও সে জ্ঞানের পূর্ণ প্রয়োগ। অথচ মুসলমানদের পক্ষ থেকে অতি অবহেলা হয়েছে উভয় ক্ষেত্রেই। না হয়েছে কোরআন থেকে যথাযথ জ্ঞান-লাভ, না হয়েছে কোরআনী হুকুমের প্রয়োগ। ফলে সাফল্য ও বিজয় না বেড়ে বেড়েছে পরাজয় ও অপমান। অথচ কোরআনই হল সমগ্র মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহতায়ালার শ্রেষ্ঠ নিয়ামত, - স্বর্ণ, তেল, গ্যাস বা অন্য কোন সম্পদ নয়। একমাত্র এ নিয়ামতটি পৌঁছাতেই মহান আল্লাহতায়ালা ২৩ বছর ধরে এ ধরাধামে তাঁর মহান ফেরেশতা জিবরাইল (আঃ)কে পাঠিয়েছেন, অন্য কোন সম্পদ পৌঁছাতে নয়। এ দানের বরকতেই আরবের নিঃস্ব ও বর্বর মানুষেরা শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হতে পেরেছিলেন। পেয়েছিলেন বিজয়ের পর বিজয়ের সম্মান। কোরআনের সে ক্ষমতা আজও বর্তমান। সে কোরআনি শক্তির বিস্ফোরণ ঘটতে পারে যে কোন মুসলিম দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও। আর তখন বাংলাদেশের মানুষও পেতে পারে অভূতপূর্ব বিজয় ও ইজ্জত। একমাত্র এ পথেই বিলুপ্ত হতে পারে দূর্নীতিগ্রস্ত দেশে হওয়ার অপমান। তবে সে জন্য দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে খোদ বাংলাদেশের মানুষকে। কারণ আল্লাহর এ ভূমিতে এ দায়ভার একমাত্র তাদেরই। একাজে প্রত্যেকেই তারা আল্লাহর খলিফা। এবং খেলাফতের সে দায়িত্বটি পালিত হতে পারে কোরআনী প্রেসক্রিপশনের পূর্ণ অনুসরণের মধ্য দিয়ে। আর ইসলামকে বিজয়ী করার এটিই হলো একমাত্র পথ।